'বিশ্বপরিচয়' ও রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা

সোমনাথ চক্রবর্ত্তী

আজ থেকে বেশ কয়েক দশক আগে যখন আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের বাংলা বিষয়ে একটি বিশেষ বিষয় পাঠ্য ছিল, যার নাম ছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই বিশেষ অংশটি শুরু হত চর্যাপদ থেকে এবং শেষ হত আধুনিক বাংলা উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদিতে। আমাদের শিক্ষক মহাশয় যখন ছোট গল্প প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, খুব সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আলোচনায় এসে পড়েছিল। আমাদের বাংলার শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন যে আমরা যদি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা সাহিত্যে সমস্ত অবদানের কথা ভুলে যাই, শুধুমাত্র তাঁর ছোট গল্পের কথাটুকু মনে রাখি, তাহলেও তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ছোট গল্পকার রূপে পরিচিত বা বিখ্যাত হতেন। আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের এই উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম।

এর থেকে অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন গুরুদেবের লেখায় পড়লাম 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু'। এই লাইনটিকে আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের লেখা শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন যুগের ভারতীয় পণ্ডিত জনেরা একটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জটিল বিষয় ব্যক্ত করে দিতেন। যার ব্যাখ্যা দিতে হলে পাতার পর পাতা লিখতে হয়। এই লাইনটির ক্ষেত্রে একই উক্তি করলেও তা অতিশয়োক্তি হবে না। বিশৃঙ্খল গতি কতকগুলি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে সুন্দর নৃত্যে পরিণত হয়। একইভাবে একটি পরমাণু যার জন্ম হচ্ছে কোনও পরীক্ষাগারে অথবা এই মহাবিশ্বের কোনও এক প্রান্তে, সে আমাদের কাছে অদৃশ্য এবং হয় বিশৃঙ্খল গতিযুক্ত অথবা একমুখি শ্রোতে গতিশীল। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে যে সমস্ত পরমাণু জন্মগ্রহণ করেছে তারা যদি একক অবস্থায় থাকত তবে তারা সকলেই পূর্বোল্লেখিত ধর্ম বিশিষ্ট হত। কিন্তু এই মহাবিশ্বে পরমাণুরা প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম মেনে একে অন্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে এই সুন্দর মহাবিশ্ব তৈরি করেছে। সুতরাং নৃত্যের সৃষ্টির সঙ্গে

পরমাণুর এই সুন্দর মহাবিশ্ব সৃষ্টির অনেক সাদৃশ্য আছে। মনে হয় বৈসাদৃশ্য শুধু একজায়গায়, তা হল নৃত্য সৃষ্টিতে নিয়ম তৈরি করেছে মানুষ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে এই নিয়ম সামঞ্জস্য পূর্ণ। অন্যদিকে পরমাণুর এই সুন্দর মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে যে নিয়ম-কানুন তা তৈরি করেছে প্রকৃতি স্বয়ং।

'বিশ্বপরিচয়' প্রকৃতি পরিচয়ের গ্রন্থ নয়। এই পুস্তকখানি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে পদার্থ বিদ্যার সাধারণ জ্ঞান না থাকলে এই গ্রন্থের রসাস্বাদন প্রায় অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, যিনি বয়সের দিক থেকে গুরুদেবের থেকে অনেক ছোট।

গুরুদেব বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সীতানাথ দত্ত মহাশয় এবং স্বয়ং পিতৃদেব। ডালহৌসি পাহাড়ের ডাক-বাংলোয় অন্ধকার রাত্রিতে ঝকমকে নক্ষত্রখচিত আকাশে পিতৃদেবের কাছ থেকে তিনি গ্রহ-নক্ষত্র চেনার পাঠ নিতেন। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য পেতেন পিতৃদেবের কাছ থেকে। এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি কিশোর বয়সে ধারাবাহিক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি গুরুদেবের যে অনুরাগ তা তাঁর লেখা থেকেই স্পষ্ট হয়— 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।'

গুরুদেব বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত জনের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়— 'মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ'। তবে এই গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে তিনি এই সমস্ত তথ্য অন্ধভাবে বা যান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করেননি। উদাহরণ স্বরূপ, এই গ্রন্থে আলোকের বর্ণালী সংক্রান্ত যে আলোচনা স্থান পেয়েছে তা যদি স্নাতক পর্যায়ের ছেলে-মেয়েরা পাঠ করে তবে বর্ণালীর সঙ্গে যুক্ত পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় খুব সহজে অনুধাবন করতে পারবে।

এই গ্রন্থ লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে যে সাহিত্যের কোনও রূপ বিবাদ নেই তা বারে বারে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন- 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই'। — 'অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।'

বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে পদার্থবিদ্যার বহু জটিল বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গুরুদেব বিশ্লেষণ করেছেন— যেমন বর্ণালী সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, একইভাবে আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার তথা তাত্ত্বিক মহাকাশ বিদ্যার দার্শনিক দিকগুলোও গুরুদেব অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন।

পদার্থবিদ্যায় universal constant বা ধ্রুব সত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গুরুদেব লিখছেন— 'নিত্য বলে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়। যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র'।

বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধে তিনি লিখছেন— 'বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে যে সব বিপরীত বার্তাবহ ইসারা আসছে, বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে সেটা হয়ত কোনও একটা জটিল গণনার ব্যাপার এসে ঠেকবে।'

গুরুদের বিশ্বসৃষ্টির দার্শনিক দিকেও আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখছেন— 'আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরেনি। আকাশটাও বুদবুদ কিনা এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে, সৃষ্টি চলছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নতুন সৃষ্টি উদভাসিত হচ্ছে; ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে; তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।'

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় উক্তির আলোচনা স্বরূপ বলা যায় যে Switzerland-এর CERN পরীক্ষাগারে LHC-তে যে সমস্ত বিজ্ঞানী কাজ করছেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য অবশ্যই উদঘাটন করতে পারবেন।

প্রথম ও তৃতীয় উক্তিকে যদি একত্রিত করা হয় তবে তা বর্তমান যুগের Big Bang তত্ত্বের বিকল্প Cyclic universe তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। Cyclic universe তত্ত্বে স্থান-কালের আদিও নেই অন্তও নেই। এই eternal স্থান-কালে আমাদের মহাবিশ্ব বারে বারে তৈরি হচ্ছে আবার বিনাশ ঘটছে। Big Bang দুটি Consecutive Cycle-এর মধ্যবর্তি পর্যায়। মহাবিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে বারে বারে এই Big Bang এর মধ্যে দিয়ে এবং বিনাশ ঘটছে Big Crunch-এর মধ্যে দিয়ে। প্রলয়কালে সমস্ত জড় ও জীব জগৎ সেই আদি জ্যোতি, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় primordial energy, তাতে বিলিন হয়ে যাবে এবং পুনরায় আবির্ভাব ঘটবে আর এক নতুন মহাবিশ্বের।

এই তত্ত্বকথার দার্শনিক মত আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি-উপনিষদ ও বেদান্তে লিপিবদ্ধ আছে। উপনিষদের কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকটিও উপনিষদের আলোকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এই মত যে আদৌ কাল্পনিক নয়, তার প্রমান পাই বিশ্বের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা পত্রে। এই সমস্ত পণ্ডিতজনেরা— যাঁরা অত্যন্ত জটিল Brane মহাকাশ তত্ত্ব, M-থিওরি ও string তত্ত্বে গবেষণা করছেন এবং এই বিষয়ে দিকপাল, তাঁরাও এই অভিমত পোষণ করেন এবং অনেকেই তাঁদের গবেষণা পত্রের foot note-এ উপনিষদ ও বেদান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

উপসংহারে বলতে হয় যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে যেমন একদিকে যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র নন, তাঁদেরকে বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে উপদেশ দিয়েছেন, বিজ্ঞানের ছাত্রদের সাহিত্যের সহায়তা গ্রহণ করতে বলেছেন, তেমনই অন্য একদিকে এই গ্রন্থের দার্শনিক দিকটিতে প্রাচীন ভারতের যে দার্শনিক ভাবধারা, চিন্তাধারা যা লিপিবদ্ধ আছে উপনিষদ ও বেদান্তে তাঁকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে উপনিষদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মধ্যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

লেখক বিশ্বভারতীর পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।